ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 134-140
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.442

প্রয়োজনতত্ত্ববিচার

শক্তি পাল, *স্বাধীন গবেষক, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The present research paper discusses the classical and philosophical significance of the theory of 'Prayojana' in detail. In the context of phonology, the etymology, definition and its causal role of the word 'Prayojana' are explained and it is shown that Prayojana acts as the main motivation behind every action in human life. The various interpretations and applications of 'Prayojana' in different philosophies such as Kāvyāśāstra, Vyākaraṇa, Nyāya, Vedānta and Sāṃkhya are comparatively analyzed. In particular, the role of Prayojana in Anubandhacatuṣṭaya and its relationship with the knowledge-instinct are discussed. The significance of recognizing 'Prayojana' as a separate entity in Nyāya philosophy and the division of secondary and primary Prayojanas are also explained here. On the other hand, Nāgārjuna's critical position in Buddhist philosophy is also included in the discussion. The article proves that 'Prayojana' is not just a terminological concept, but is the main driving force of human thought, knowledge process and action-instinct.

Keywords: Prayojana, Śabdaśakti, Anubandhacatuṣṭaya, Jñāna, Pravṛtti, Nyāya, Vedānta, Sāṃkhya, Nāgārjuna, Prayojana

বাক্ জ্যোতিস্বরূপ। সমুদ্রবৎ অক্ষীণ ও মহিমময়।[১] বাক্ দেবী রূপে উপাসিতা পূজিতা। যার আশ্রয়ে কবি নিজের ভাব অভিব্যক্ত করেন। ভাবের অভিব্যক্তির মাধ্যম হচ্ছে বাক্ বা শব্দ।কবি ভাবের প্রকাশের জন্য কিছু শব্দ চয়ন করেন, ভাবের পূর্ণতায় পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। এই কাব্য অভিব্যক্তির বোধের জন্য শব্দে নিহিত অর্থের মর্মে অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। একই অর্থযুক্ত অনেক শব্দ হয় এবং একই শব্দের বহু অর্থ প্রচলিত হয়, কোন শব্দটি অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশের জন্য উপযুক্ত যা শ্রবণে পাঠক এই ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন তা কবির দক্ষ প্রতিভার উপর নির্ভর করে এবং এজন্য শব্দের শক্তির সাথে সম্পূর্ণ পরিচিত হওয়া দরকার। শব্দের অর্থ থেকে কাব্য বোধগম্য হয়। শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধকে শব্দ-শক্তি বলা হয়। এই শব্দশক্তি কখন পদশ্রবনমাত্রে কখনও বা লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনে উপলব্ধ হয়।

[১] বাগ্বৈ সমুদ্রো ন বৈ বাক্ক্ষীয়তে ন সমুদ্রঃ ক্ষীয়তে - ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পঞ্চিকা ৫, অধ্যায় ৫, ব্রাহ্মণ অংশ (প্রায় ৫.৫.৩), সম্পা. Martin Haug, *The Aitareya Brāhmaṇam of the Rigveda* (বোম্বাই: Government Central Book Depot, ১৮৬৩), পৃ. ৩০০–৩০৫।

প্রয়োজনের ধারণা : শাস্ত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ:

ভারতীয় শাস্ত্র সমূহে এই শব্দ জ্যোতিঃ রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। শব্দ প্রয়োগে জাগতিক ব্যবহার যেমন সাধিত হয় তেমনি শব্দের গূঢ়ার্থবোধে অন্তরে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাই জীবের ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণ সাধনে শব্দের ভূমিকা অনবদ্য। এজন্য শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়েছে।

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শব্দের এই মাহাত্ম্যের কথা স্মরণে রেখে এর প্রয়োগ বিষয়ে যত্নবান হয়েছেন। একই শব্দ নানার্থের প্রকাশকরূপে শব্দভাণ্ডারকে যেমন সুসমৃদ্ধ করেছে তেমনি শব্দের যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা শাস্ত্রকারের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে। শব্দ নিজশক্তিবলে কখনো সরাসরি অর্থ বুঝিয়েছে কখনো বা স্বীয় শক্তির সঙ্গে সম্বদ্ধ লক্ষণার আশ্রয়ে ব্যাপক ও গভীর অর্থের বোধক হয়েছে। এইভাবে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ। এই রকম একটি পারিভাষিক শব্দ হল 'প্রয়োজন'। প্রয়োজন পদটি যা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মানুষ দৈনন্দিন জীবনে ব্যাবহার করে তেমনি গূঢ় অর্থের ব্যঞ্জক রূপে শাস্ত্রে প্রযুক্ত হয়। প্রয়োজন পদটির সুগভীর তাৎপর্যকে চিন্তা করে শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

"यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यते।[২]

অথবা

"प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्त्तते।"[৩]

–ভাট্টসম্প্রদায়ের পথিকৃত কুমারিল ভট্টের এই উক্তির সার্থকতা সমাজের প্রতিটি স্তরে ও প্রতি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রয়োজন ব্যতীত মনুষ্য বা মনুষ্যেতর জীব কেউই কোন কাজে নিযুক্ত হয় না। প্রয়োজনই সেই উদ্দীপক যা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে জীবকে উদ্দীপিত করে। এই প্রয়োজনকে প্রাথমিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হলে বলা যেতে পারে– প্রয়োজন হল সেই হেতু যা ব্যক্তিকে কোন কিছুতে প্রবৃত্ত করে। 'প্রয়োজন' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করলেও সেই অর্থই দ্যোতিত হয়। প্র-$\sqrt{যুজ্}$ +ল্যুট্– এইভাবে শব্দটি গঠিত, যার আপাত বা সাধারণ অর্থ হেতু। "प्रयुज्यते व्यवहृयते इदमिति प्रयोजनम्"[৪] অর্থাৎ যা কোন কিছুতে প্রবৃত্ত করায়, সেটিকেই প্রয়োজন বলা হয়; এখানে 'প্রয়োজন' পদটি কেবল একটি সাধারণ অভিপ্রায় নয়, বরং জ্ঞেয় পদার্থের রূপে বিবেচিত, যা কারো মনোভাব, চেতনা বা কর্মকাণ্ডকে নির্দেশিত করে এবং লক্ষ্যপ্রাপ্তি ও কর্মকৌশলের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

সাধারণ মানুষের জীবনে এই প্রয়োজন দ্বিবিধ রূপে প্রকাশিত– আপাত ও পরিণামী। লৌকিক উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার আপাত প্রয়োজন নম্বর প্রাপ্তি বা ডিগ্রি লাভ, কিন্তু শিক্ষার দ্বারা তার যে জ্ঞান প্রাপ্তি ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয় তা হল পরিণামী প্রয়োজন। এই প্রয়োজন যে শুধু সাধারণ জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করে তাই নয়, বিভিন্ন আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ, দার্শনিক প্রমুখের চিন্তাধারাতে স্থান করে নিয়েছে। যেমন– কাব্যশাস্ত্রকারেরা কাব্যপাঠের প্রয়োজন, বৈয়াকরণেরা শব্দানুশাসনের প্রয়োজন,

---

২ ন্যায়সূত্র (প্রয়োজন-প্রকরণ), (বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ), সম্পা. ও অনুবাদ: গঙ্গানাথ ঝা, (বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯১৩), পৃষ্ঠা ৪৫–৪৭।

৩ *হিতোপদেশ,* (প্রস্তাবনা), শ্লোক ১, সম্পাদনা: কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরাব, *হিতোপদেশ* (নারায়ণ রচিত), (মুম্বাই: নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৮৯০), পৃষ্ঠা ১–২।

৪ *ন্যায়সূত্র* (প্রয়োজন-প্রকরণ), (বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ), সম্পা. ও অনুবাদ: গঙ্গানাথ ঝা, (বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯১৩), পৃষ্ঠা ৪৬–৪৮ ।

বেদান্তদর্শনে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের অন্যতম হিসাবে প্রয়োজনের, ন্যায়দর্শনে পৃথক পদার্থ হিসাবে প্রয়োজনের আলোচনা করেছেন।

আলঙ্কারিকগণের অন্যতম আচার্য মম্মট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' নামক গ্রন্থের প্রথমোল্লাসে কাব্যের অর্থাৎ কাব্যরচনার প্রয়োজন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন–

" কাব্যং যশসেऽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃত্তয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।।"[৫]

অর্থাৎ কাব্য যশ লাভের জন্য, অর্থ লাভের জন্য, সামাজিক রীতি নীতি জানার জন্য, অমঙ্গল নিবারণের জন্য, অবিলম্বে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট আনন্দের জন্য ও কান্তা তুল্য উপদেশ লাভের জন্য রচিত হয়। অতএব এগুলি হল কাব্যের প্রয়োজন। আচার্য মম্মট উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন কালিদাস প্রমুখ মহাকবিদের কথা, যাঁরা কাব্যরচনার দ্বারা যশস্বী হন। ধাবক নামক কবি শ্রীহর্ষের রত্নাবলী রচনার দ্বারা অর্থলাভ করেন। কাব্যের মাধ্যমে সামাজিক শিষ্ট আচরণ সমূহের জ্ঞান হয় ইত্যাদি।

আচার্য দন্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' নামক গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োজন ব্যক্ত করে বলেছেন–

"ইহ শিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্বথা।
বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্তে।।"[৬]

অর্থাৎ পাণিনি, বররুচি প্রমুখের দ্বারা উপদিষ্ট যে বাক্ বা শব্দ তা লোকযাত্রা বা লোকব্যবহারের প্রবর্তক বা নিয়ন্ত্রক। এই শব্দের দ্বারা মনুষ্য তথা দেবতাগণও ব্যবহার সম্পাদন করে।

অনুরূপভাবে ত্রিমুনি সম্প্রদায়ের কনিষ্ঠ পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্য' গ্রন্থের পস্পশাহ্নিকে ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসনের প্রয়োজন উল্লেখ করেছেন। "अथ शब्दानुशासनम्"[৭]– এই উক্তির দ্বারাই শব্দানুশাসনের প্রয়োজন যে সাধুশব্দ জ্ঞান তা প্রতীত হয়। শাস্ত্র শুরু করার আগে শুভ সূচনা বোঝাতে "अथ" ব্যবহৃত হয়। এই সাধু শব্দ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– "रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः"।[৮] অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃতের রক্ষা, বিপরিণাম, আগম, লঘু উপায়ে অগাধ শব্দভান্ডার আয়ত্তীকরণ এবং অসন্দিগ্ধ শব্দ প্রয়োগ– এই পাঁচটি মুখ্য প্রয়োজনে ব্যাকরণ অবশ্য পঠনীয়।

প্রায় সমস্ত দর্শনেই 'প্রয়োজন'– এর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে। দার্শনিক বিচারশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য অনুবন্ধ চতুষ্টয় নিরূপণ। 'अनुवध्नाति इति अनुवन्धः' অর্থাৎ যা কাউকে কোন কিছুর সাথে আবদ্ধ করে তাই অনুবন্ধ। শাস্ত্রে এটি জ্ঞানকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সহজবোধ্য করে তোলে। আবার বলা যায়– 'अनु पश्चात् स्वज्ञानोत्तरं बध्नन्ति आसञ्जयन्ति प्रवर्तयन्ति इति अनुवन्धाः।' অর্থাৎ যে বিষয়ের জ্ঞান হলে পাঠার্থীর শাস্ত্রে প্রবৃত্তি জন্মায়, তাকে বলে অনুবন্ধ। সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর 'বেদান্তসার' নামক বেদান্তদর্শনের প্রকরণ গ্রন্থে চারটি অনুবন্ধের উল্লেখ করে বলেছেন– "तत्र अनुवन्धो नाम अधिकारी-विषय-सम्बन्ध-प्रयोज- नानि।"[৯] অধিকারী হল গ্রন্থ বা শাস্ত্রটির যোগ্য পাঠার্থী, বিষয় হল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, সম্বন্ধ হল

---

[৫] *কাব্যপ্রকাশ,* আচার্য মম্মট, প্রথম উল্লাস, অনুবাদক- ডঃ রামানন্দ আচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪০৪, পৃঃ ১

[৬] *কাব্যাদর্শ,* আচার্য দন্ডী, প্রথম পরিচ্ছেদ, অনুবাদক-ডঃ অনিল চন্দ্র বসু, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬, পৃঃ ৫৩

[৭] মহাভাষ্যম্, শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলি, সম্পাদক- ড. গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০২, পৃঃ ১

[৮] মহাভাষ্যম্ (পস্পশাহ্নিক), সম্পাদকডঃ গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০২, পৃঃ ২০

[৯] বেদান্তসার, সদানন্দ যোগীন্দ্র, অনুবাদক স্বামী অমৃতত্বানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮, পৃঃ ৫

শাস্ত্র ও বিষয়ের সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন হল শাস্ত্রটি অধ্যয়নের ফল।এদের মধ্যে বিষয় ও প্রয়োজনই বিশেষতঃ প্রেক্ষাবান ব্যক্তির শাস্ত্রে প্রবৃত্তির প্রযোজক।

'বেদান্তসার' গ্রন্থের প্রয়োজন উল্লেখের দ্বারা গ্রন্থকার বেদান্ত দর্শনের প্রয়োজন ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে– "प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः तत्स्वरूपानन्दावाप्तिश्च।"[১০] অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্য– রূপ প্রমেয় সম্বন্ধে আমাদের যে অজ্ঞান তার নিবৃত্তি এবং তৎস্বরূপানন্দ প্রাপ্তি। সুতরাং অজ্ঞান নিবৃত্তি ও তার ফলে সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তিই হল এই গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন। এই গ্রন্থ পাঠের দ্বারা উক্ত প্রয়োজন সাধনের সমর্থন বেদে উক্ত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে– 'तरति शोकम् आत्मविद्।' (৩.১.৩) অর্থাৎ আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই সকল শোক থেকে মুক্ত থাকে, কারণ এখানে 'আত্মজ্ঞ' বলতে মূলত ব্রহ্মজ্ঞকে বোঝানো হয়েছে; এবং এই আত্মজ্ঞান অর্জন সম্ভব হয় শুধুমাত্র অজ্ঞানতা নিবৃত্তির মাধ্যমে, অর্থাৎ ব্যক্তি যখন নিজের প্রকৃত স্বরূপ ও ব্রহ্মের চিরন্তন সত্তার উপলব্ধি করে, তখন সমস্ত দুঃখ ও ভোগ থেকে মুক্তি লাভ করে। মুন্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে– ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति (মুঃ ৩/২/৯)।

'বেদান্ত পরিভাষা' গ্রন্থে প্রয়োজন নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "यदवगतं सत्स्ववृत्तितये- ष्यते तत् प्रयोजनम्।"[১১] অর্থাৎ যা জ্ঞাত হলে স্ববৃত্তিত্বরূপে (এটি আমার হোক এইভাবে) ইচ্ছার বিষয় হয় তাই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন দ্বিবিধ-মুখ্য ও গৌণ। সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি হল মুখ্য প্রয়োজন এবং এর জন্য যে প্রযত্ন তাই গৌণ প্রয়োজন। এই গ্রন্থ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় প্রয়োজনের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লৌকিক যথা- সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি এবং এই প্রয়োজনের দ্বারা সকল জীব ও সমস্ত কর্ম ব্যাপ্ত হয়। শাস্ত্রীয় প্রয়োজন বিষয়ে বলা হয়েছে- অবিদ্যা নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিই হল পুরুষের প্রয়োজন।

শ্রী অন্নংভট্ট তাঁর ন্যায়বৈশেষিকসম্মত গ্রন্থ 'তর্কসংগ্রহ'-এর মঙ্গলাচরণ শ্লোকের দ্বারাই গ্রন্থের অনুবন্ধ তথা প্রয়োজন উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রথম কারিকায় বলেছেন–

"निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम्।
बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः।।"[১২]

এই তর্কসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন হল 'বালানাং' অর্থাৎ প্রথম পাঠার্থীদের সুখবোধ বা অনায়াসবোধ। ন্যায়দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলির প্রতিপাদক পূর্বরচিত গ্রন্থগুলি সদ্য নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে দুরূহ হওয়ায় তাদের অনায়াস বোধের জন্য এই গ্রন্থরচনা। এটি গ্রন্থরচনার আপাত প্রয়োজন। চুড়ান্ত প্রয়োজন হল সপ্ত পদার্থের সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ, কারণ মোক্ষ লাভই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার পরম প্রয়োজন।

কাব্যের প্রয়োজন বা ফল সম্পর্কে আচার্য ভামহ বলেছেন–

"धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।
प्रीतिं करोति कीर्तिं च साधुकाव्यनिषेवणम्।।"[১৩]

কাব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের চার পুরুষার্থ— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— উপলব্ধি করানো, পাশাপাশি শিল্পকলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, খ্যাতি বৃদ্ধি এবং মানসিক আনন্দ প্রদান করা; আচার্য ভামহের মতে,

---

[১০] বেদান্তসার, সদানন্দ যোগীন্দ্র, অনুবাদক স্বামী অমৃতত্বানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮, পৃঃ ২০

[১১] বেদান্তপরিভাষা, শ্রীবদ্ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, অনুবাদক শ্রী শ্রীমোহন তর্ক বেদান্ত তীর্থ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৭৭, পৃঃ ১৮৮

[১২] তর্কসংগ্রহ, অন্নংভট্ট, অনুবাদক শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১০, পৃঃ ১

[১৩] কাব্যালংকার, আচার্য ভামহ, ভাষ্যকার দেবেন্দ্রনাথ শর্মা, বিহার-রাষ্ট্রভাষা-পরিষদ, পৃঃ ৭

কবিতা রচনার মাধ্যমে কবি কেবল মানুষের মন ও সমাজকে প্রভাবিত করেন না, বরং তার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে তিনি খ্যাতির অমরত্বও লাভ করেন।

আলঙ্কারিক আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে নিজ মত প্রকাশ করে বলেছেন–

"चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि।
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते।।"[১৪]

আচার্য বিশ্বনাথ কেবল বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে অক্ষম ব্যক্তিদের তথা শাস্ত্র অবগত হতে সক্ষম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও বেদাদির পরিবর্তে কাব্য থেকে চতুর্বর্গ লাভের পরামর্শ দিয়েছেন। আচার্য বিশ্বনাথের মতে কাব্যের মাধ্যমে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অর্জন করা সম্ভব। এগুলি কাব্যের প্রয়োজন।

আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' নামক ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা গ্রন্থে বলেছেন–

"निजनिर्मितकारिकावली मतिसंक्षिप्तचिन्तनोक्तिभिः
विशदीकरवानि कौतुकान्ननु राजीवदयावशंवद"।।[১৫]

তিনি তাঁর পৌত্র রাজীবের প্রতি দয়ার্দ্রহৃদয়ে তার অনায়াস বোধের নিমিত্ত নিজ রচিত কারিকাগুলির বিশদীকরণ করেছেন। নিজস্ব চিন্তার সৃজনশীল প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি জ্ঞানচর্চায় অবিরাম কৌতূহল লালন করা এবং গুরু ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ধারণ করাও সমানভাবে প্রয়োজন।

সাংখ্য দর্শনেরও মৌলিক প্রয়োজন ব্যক্ত করে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর 'সাংখ্যকারিকা' গ্রন্থে বলেছেন–

"दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदवघातके हेतौ।
दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात् ।।१।।[১৬]
दृष्टवदनुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः।
तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् ।।२।।"[১৭]

অনাদি মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ অনাত্মবিষয়কে আত্মস্বরূপ মনে করার ফলে মিথ্যাজ্ঞানহেতু বদ্ধ জীব অহর্নিশ দুঃখ রাশি অনুভব করে। সদা সর্বদা বিদ্যমান এই ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতবশতঃ তা থেকে মুক্তির উপায় জীব অন্বেষণ করে। এই দুঃখনিবৃত্তি পূর্বক মুক্তিলাভই হল প্রয়োজন। কিন্তু দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক উপায়ে এই দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি না হওয়ায় সাংখ্যদর্শনে ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞ–এর বিবেক জ্ঞান বা ভেদজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এবং এই ভেদজ্ঞানের উপায় নির্দেশ করে সাংখ্য প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহ। এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই সাংখ্যশাস্ত্র বিচার্য বা পঠনীয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই প্রয়োজন কোথাও হেতু, কোথাও উদ্দেশ্য, কোথাও বা অনুবন্ধরূপে স্বীকৃত ও পর্যালোচিত।

কিন্তু ন্যায়দর্শনের প্রবক্তা গৌতম এই প্রয়োজনকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে যে 'পদার্থ' কি? "पदस्य अर्थः पदार्थः"[১৮] অর্থাৎ পদের অর্থই পদার্থ।

---

১৪ সাহিত্যদর্পণ, বিশ্বনাথ কবিরাজ, প্রথম পরিচ্ছেদ, অনুবাদক শ্রী রামচন্দ্র তর্কবাগীশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃঃ ৩

১৫ ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, বিশ্বনাথ আচার্য, অনুবাদকডঃ অনামিকা রায় চৌধুরী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৯, পৃঃ ১

১৬ ঈশ্বরকৃষ্ণ। *সাংখ্যকারিকা।* অনুবাদক- স্বামী ভাবঘনানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ ১

১৭ ঈশ্বরকৃষ্ণ। *সাংখ্যকারিকা।* অনুবাদক- স্বামী ভাবঘনানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ ৩

১৮ *তর্কসংগ্রহ,* অন্নংভট্ট, অনুবাদক- শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১০, পৃঃ ১৩

কিন্তু এক্ষেত্রে পদার্থ শব্দটি পারিভাষিক। জ্ঞানার্থক 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'থ' প্রত্যয়যোগে 'অর্থ' শব্দটি নিষ্পন্ন। "ऋच्छन्ति गच्छन्ति इन्द्रियाणि यस्मिन् स अर्थः, इन्द्रियानुभवयोग्यः, ज्ञेयः अभिधेयः वा।"[১৯] অর্থাৎ যা জ্ঞেয় বা অভিধানযোগ্য তাই পদার্থ, সুতরাং বলা যায় "प्रतीतिविषयत्वं पदार्थत्वम्।" সপ্তপদার্থীকার শিবাদিত্যমিশ্রের মতে- "प्रमितिविषयाः पदार्थाः।"

এই পদার্থের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। বৈশেষিক দর্শনে এর সংখ্যা সাত হলেও ন্যায়দর্শনে তা ষোলো।ন্যায়সূত্রে আচার্য গৌতম বলেছেন– "प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभासच्छल-जातिनिग्रहस्थानानांत- त्त्वज्ञानान्निरश्रेयसाधिगमः" (ন্যায়সূত্র ১/১/১) অর্থাৎ এই ষোলোটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের উপযোগী হয়। ন্যায়দর্শনে তথা অন্যান্য দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয় বিচার গুরুত্ব লাভ করেছে। মহর্ষি গৌতম ও তার অনুগামী ভাষ্যকার বাৎস্যায়ণ এবং পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ 'প্রমাণ' 'প্রমেয়' ছাড়া 'সংশয়' 'প্রয়োজন' প্রভৃতি পদার্থ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।মহর্ষি গৌতম চতুর্থ পদার্থ প্রয়োজনের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন– "यमर्थमधिकृत्य प्रवर्त्तते तत् प्रयोजनम्" (ন্যায়সূত্র ১/১/২৪)।অর্থাৎ যে পদার্থকে অধিকার করে অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বা পরিত্যাগযোগ্যরূপ নিশ্চয় করে জীবের প্রবৃত্তি হয় তাই হল প্রয়োজন। এই সূর্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ণভাষ্যে বলা হয়েছে–

येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम्।यमर्थमभीप्सन् जिहासन् वा कर्म
आरभते, तेनानेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्याः व्याप्ताः। অর্থাৎ যার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাই প্রয়োজন। কোন বিষয় বা বস্তুকে লাভ করা বা ত্যাগ করার ইচ্ছা থেকেই সে কর্ম করে। এই বস্তু বা বিষয় হল তার প্রয়োজন, যার দ্বারা সমস্ত প্রাণী, সকল কর্ম ও সমস্ত বিদ্যা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী আলোচনায় এই ব্যাপ্তি আমরা লক্ষ্য করেছি। জীবের প্রয়োজনমূলা প্রবৃত্তি তাকে লক্ষ্যবস্তু লাভে সহায়তা করে। ভাষ্যকার কেবল গ্রাহ্য নয়, ত্যজ্য পদার্থকেও প্রয়োজন বলেছেন।

নিষ্প্রয়োজন কোন কর্ম বা বিদ্যা হয় না বলে 'প্রয়োজন' কে ন্যায়শাস্ত্রে পৃথক পদার্থরূপে গণ্য করা হয়েছে। এই প্রয়োজন গৌণ মুখ্য ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন সাধারণ জীবের প্রয়োজন দুঃখনিবৃত্তি সুখপ্রাপ্তি। একে স্বতপ্রয়োজন বলা যেতে পারে।এবং এই প্রয়োজন লাভে যে সমস্ত উপায় এবং উপায় বিষয়ক ইচ্ছা জন্মায় তাকে গৌণ প্রয়োজন বলে। কোন বস্তু গ্রহণীয় বা কোন বস্তু ত্যজ্য সেবিষয়ে নিশ্চয়ের পর জীব সেই সেই বিষয়ের প্রাপ্তি ও পরিত্যাগের উপায় অন্বেষণ করে ও সেই উপায় বিষয়ে তার প্রবৃত্তি জন্মায়। অর্থাৎ এই প্রয়োজনবুদ্ধি কর্ম প্রবৃত্তির প্রযোজক হয়। তাই একে ন্যায়সূত্রকার পৃথক পদার্থরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

উপসংহার:

বাস্তবে মানুষকে 'প্রয়োজন'ই জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, কর্মে অনুপ্রাণিত করে এবং শাস্ত্র চর্চায় প্রবৃত্ত করে। এটি জ্ঞান ও প্রবৃত্তির মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার লক্ষ্য নির্ধারণ ও সাধনে অগ্রসর হয়। অতএব, 'প্রয়োজন' কেবল পদার্থমাত্র নয়, এটি এক গভীর তাত্ত্বিক সত্য, যা মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কার্যকর ও অপরিহার্য।

'প্রয়োজনের' এই সর্বব্যাপি তাৎপর্য আস্তিক দর্শনের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে এই 'প্রয়োজন' পদার্থ বিষয়ে একটি অভিনব অভিমত লক্ষ্য করা যায়। প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক

---

[১৯] *ন্যায়সূত্র,* প্রণেতা মহর্ষি গৌতম; ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, (দিল্লি: মোতিলাল বনারসীদাস, ১৯৯৮), অধ্যায় ১, আহ্নিক ১

আচার্য নাগার্জুন তাঁর 'বৈদল্যসূত্র' গ্রন্থে এবিষয়ে ভিন্ন মত উপস্থাপন করেছেন।বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সংস্থাপক নাগার্জুনের মতে – "न सिद्धति प्रयोजनम्, सत्त्वादसत्त्वाच्च।" (বৈদল্যসূত্র ১/২৩) কুম্ভকার যখন ঘট প্রস্তুতিতে প্রযুক্ত হয় তখন ঘট হল প্রয়োজন। নাগার্জুনের মতে ঘট মৃৎপিন্ডের মধ্যে বিদ্যমান, তাই ঘট নির্মাণের প্রবৃত্তি নিরর্থক, অর্থাৎ যা 'সৎ' রূপে বিদ্যমান তাকে সৃষ্টির প্রবৃত্তি নিরর্থক। তাই বস্তু সৎ বা অসৎ যাই হোক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এইভাবে আচার্য নাগার্জুন নৈয়ায়িক আচার্য গৌতমের এই সুপ্রসিদ্ধ পদার্থ বিবেচন অংশকে খন্ডন করে ষোলোটি পদার্থের কোনটিরই সিদ্ধিকে স্বীকার করেননি। তাঁর এই অভিমত নিঃসন্দেহে পৃথক আলোচনার বা তুলনাত্মক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তাই প্রয়োজন কেবল পদমাত্র নয়, এটি তত্ত্বস্বরূপ। যেতত্ত্বে জ্ঞান থেকেই প্রমাতাপুরুষ শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তাই প্রয়োজন যেমন জ্ঞেয় পদার্থ তেমন জ্ঞান নিরূপণে সহায়ক স্বরূপ। প্রয়োজন বুদ্ধি প্রতিটি প্রাণীকে প্রবৃত্তি করে প্রবৃত্তির মূলীভূত প্রয়োজনের তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

বাংলা গ্রন্থ:

১. আচার্য মম্মট। কাব্যপ্রকাশ। অনুবাদক ডঃ রামানন্দ আচার্য। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪০৪।
২. আচার্য দন্ডী। কাব্যাদর্শ। অনুবাদক ডঃ অনিল চন্দ্র বসু। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬।
৩. ঈশ্বরকৃষ্ণ। সাংখ্যকারিকা। অনুবাদক স্বামী ভাবঘনানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০।
৪. ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র। বেদান্তপরিভাষা। সম্পাদক শ্রী গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য। কলিকাতা: শ্রী ফণিভুষণ হাজরা গুপ্তপ্রেশ, ১৩৬৭।
৫. বিশ্বনাথ কবিরাজ। ভাষাপরিচ্ছেদ। অনুবাদক ডঃ অনামিকা রায় চৌধুরী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৯।
৬. বিশ্বনাথ কবিরাজ। সাহিত্যদর্পণ। অনুবাদক শ্রীরামচন্দ্র তর্কবাগীশ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৮।
৭. মহর্ষী পতঞ্জলি। মহাভাষ্যম্ (পস্পশাহ্নিক)। সম্পাদক ডঃ গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য। কলকাতা: সংস্কৃত ডিপো, ২০০২ ।
৮. শ্রীবদ্ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র। বেদান্তপরিভাষা। অনুবাদক শ্রী শ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৭৭।
৯. শ্রীমদন্নংভট্ট। তর্কসংগ্রহ। অনুবাদক শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১০।
১০. সদানন্দ যোগীন্দ্র। বেদান্তসার। অনুবাদক স্বামী অমৃতত্বানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮।

হিন্দী গ্রন্থ:

১. আচার্য ভামহ। কাব্যালংকার। ভাষ্যকার দেবেন্দ্রনাথ শর্মা। পাটনা: বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, ১৯৮৫।